রবীন্দ্রনাথের *কালান্তর* : বিষয়ভাবনার গুরুত্ব

সুলতানা রাজিয়া*

[সারসংক্ষেপ : *কালান্তর* গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রাজ্ঞ অভিব্যক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সামসময়িক প্রসঙ্গ তাঁকে ভাবিয়েছিল, পারিপার্শ্বিকের নানা সংকট বা অসংগতিও। এক্ষেত্রে অন্য কারো যুক্তি অনুসরণ না করে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থেকে তিনি তাঁর কথা স্পষ্ট করে বলে গেছেন। *কালান্তরে* সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে যুগগত সমস্যাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন। শুধু ভারতীয় রাজনীতি নয় নিখিল বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন। সেসময় ভারতবর্ষের রাজনীতির পটভূমিকাও তৈরি হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। তবে কেবল রাজনীতি নয় সমাজ সমস্যার নানান ভাবনা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর মননশীল লেখনীতে। 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলোর মতামতসমূহের কয়েকটি ভাবনাকে এই গবেষণা প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে (বিশ্বভারতী, ১৩৯৬) চোদ্দটি এবং সংযোজন অংশে এগারোটি সহ মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ 'কালান্তর' হিসেবে সংকলিত হয়েছে। অন্যদিকে ৩২টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *কালান্তর* (২০১৭) গ্রন্থে। এগুলো যথাক্রমে– 'কালান্তর' (১৩৪০), 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (১৩২১), 'লোকহিত' (১৩২১), 'লড়াইয়ের মূল' (১৩২১), 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪), 'বাতায়নিকের পত্র' (১৩২৬), 'শক্তিপূজা' (১৩২৬), 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮), 'সমস্যা' (১৩৩০), 'সমাধান' (১৩৩০), 'শূদ্রধর্ম' (১৩৩২), 'বৃহত্তর ভারত' (১৩৩৪), 'হিন্দুমুসলমান' (১৩২৯), 'নারী' (১৩৪৩), 'কর্মযজ্ঞ' (১৩২১), 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৩২৪), 'চরকা' (১৩৩২), 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২), 'রায়তের কথা' (১৩৩৩), 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' (১৩৩৩), 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৩৩৬), 'হিন্দুমুসলমান' (১৩৩৮), 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' (১৩৩৮), 'নবযুগ' (১৩৩৯), 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' (১৩৪৪)। এছাড়াও 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪), 'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮), 'কনগ্রেস' (১৩৪৬), 'দেশনায়ক' (১৩৫৩), 'মহাজাতি-সদন' (১৩৪৬), 'প্রলয়ের সৃষ্টি' (১৩৪৪), 'আরোগ্য' (১৩৪৭) এবং 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮)। সব মিলে ৩৩টি প্রবন্ধ 'কালান্তর' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলোর মতামতসমূহ কবির নিজস্ব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত লেখনীর বাইরে গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য কিংবা অন্যের অনুরোধে। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ডের পরিশিষ্টে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭২২-৭২৯)। যেমন, 'সত্যের আহ্বান' তিনি পাঠ করেন কলকাতার এক জনসভায়। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় এটি লেখা। 'সমস্যা'-ও এক জনসভার বক্তৃতা। 'সমাধান'-এ তিনি শিক্ষার ওপর জোর দেন। তবে যেকোনো শিক্ষা নয়। আত্মসচেতন হবার ও আত্মশক্তি অর্জনের শিক্ষা। 'শূদ্রধর্মে' ন্যক্কারজনক এক বাস্তব কাণ্ডে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।

তিনি যে ক্ষুব্ধ হন, তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কর্মযজ্ঞ' ১৩২১-এ কলকাতা সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'-র সভায় দেওয়া তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার সারমর্ম। ১৯৩১ সালে হিজলি জেলখানার ওয়ার্ডার ও রক্ষীদের গুলিতে বেশ কিছু বন্দি স্বাধীনতা-সংগ্রামীর মৃত্যু হয়। প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী স্বাধীনতাকামীদের অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে তাঁদের ওপর ব্রিটিশরাজের অকথ্য নির্যাতন নেমে আসে। এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে ওই বছর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা গড়ের মাঠে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় তিনি যে ভাষণ দেন, তার ওপর ভিত্তি করে 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' এই রচনাটি লেখা। 'নবযুগ' ও 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' কবির শান্তিনিকেতনে দেওয়া ভাষণের ওপর ভিত্তি করে রচিত। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি প্রথমে কালান্তরে ছাপা হলেও এটি পুস্তিকাকারে আগে ছেপে বের হওয়ার পরে তা 'কালান্তর' বই থেকে বাদ দেওয়া হয়। স্বাধিকার আন্দোলনে অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে গ্রেফতার হন। তার প্রতিবাদে কলকাতায় জনসভার আয়োজন করা হলে মাদ্রাজের বিষয় নিয়ে কলকাতায় মন্তব্য বে-আইনি, এই অজুহাতে তৎকালীন সরকার তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তারই প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিবাদে এই রচনা।

গান্ধীর কর্মপন্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদমুখর হয়েছেন *কালান্তর*-এর 'সত্যের আহ্বান' (কার্তিক, ১৩২৮), 'চরকা' (১৩৩২) ও 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২)– এই তিনটি প্রবন্ধে। অর্থাৎ এখানে গান্ধীজির সঙ্গে মতাদর্শগত ব্যবধান নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন। ছয়টি রচনায় সরাসরি অথবা তির্যকভাবে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তাঁর মাথা-ব্যথার কারণ। নারী-প্রসঙ্গ এসেছে দু'টোতে। আত্মশক্তির উদ্বোধনের আহ্বান শোনা যায় বেশ ক'টিতে। এছাড়া আছে রায়তের কথা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, এবং বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আরও কিছু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। তাঁর সব কথা এখনও প্রাসঙ্গিক' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : চৌদ্দ)।

রবীন্দ্রনাথের দেশ-কাল চিহ্নিত করেছেন সৈয়দ আকরম হোসেন, যা 'কালান্তর' রচনার পটভূমি বিশ্লেষণেও প্রযোজ্য– 'দেশীয় ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তশৃঙ্খলিত সামন্ত অর্থনীতিনির্ভর বাংলার স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতার নবমানবের বিচিত্র কর্মকাণ্ড, উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন, হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার ক্রিয়া-কর্ম, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী প্রতিবাদ, অসহযোগ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক সংকট, স্বরাজ-আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা– রবীন্দ্রজীবন পরিসরে বিশেষ গুরুত্ববহ' (সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৩৮৮ : ২৭)

নামকরণ

কালান্তর শব্দের অর্থ একটা যুগের অতীত হয়ে নতুন একটা যুগের বা কালের আগমন। রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ১৯২৯-১৯৩৪, এই পর্বে ...'বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে ভারত আজ অত্যন্ত চঞ্চল; রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাকে 'কালান্তর' নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ একটি যুগের অবসানে নূতন যুগের আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪১৭ : ৫২৬)। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'কবি এখন ভাবানুভূতির এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যখন একবার স্থির হইয়া এই ঐতিহাসিক বোধের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা

এ পর্যন্ত সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার সবটা জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখার একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিল, এবং সে ইচ্ছা রূপান্তরিত হইল কালান্তরের সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে (১৯৩৭)' (নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯ : ১৮২)। অপর একজন গবেষক বলেছেন, 'কালান্তরে এসে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে,...। কালান্তরের কোনো প্রবন্ধই শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ওপর থেকে এবং ভেতর থেকেও নিঃশঙ্ক চিত্তে তিনি বুঝে ওঠার চেষ্টা করেছেন। যা তার কাছে অসত্য বা অন্যায় মনে হয়েছে তার সঙ্গে এতটুকু আপস করেননি। কিন্তু এ কোনো অভাবিতপূর্ব ব্যাপার নয়। ব্যক্তি ও সমাজের বাস্তব সমস্যা নিয়ে, ও তাদের কল্যাণ ভাবনা নিয়ে তিনি আগেও সরব হয়েছেন। তর্ক-বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েছেন' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : আট)

তিনি আরো লিখেছেন– 'কালান্তর রবীন্দ্র-মানসের একটি কালপর্ব নির্দেশ করে। এবং বইটির প্রকাশকাল মাথায় রেখে তাকে চিনে নিই। স্পষ্টত বলা না হলেও যেন এইটিই তাঁরা (গবেষকরা) বোঝাতে চান যে কবি এখানে ব্যতিক্রমী, সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তর্কপ্রবণ হয়ে উঠেছেন, যা ওই বিশেষ সময়ে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সত্যান্বেষণের পরিণাম। এই সত্য অবশ্য অতি-প্রাকৃত নয়। দ্বন্দ্ব-মুখর আঙ্গিনায় প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা তাকে রূপ দেয়। তা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের শুধু নয়। সমষ্টিরও। এবং এই সমষ্টি তৎকালীন ভারতবর্ষীয় জনগণ, যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধের বিস্তার উপমহাদেশের সীমানা ছাড়ায়। অনেক সময় নিজেদের দেখা য়োরোপের সাপেক্ষে। তাতে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের আপেক্ষিকতা মানস-ভুবনে ছায়া ফেলে। সত্যান্বেষণের পশ্চাৎপট তারা চিনে নিতে ভুল করেন না। কবির সত্য দৃষ্টি ও সৎ বাক্য তাঁদের অভিভূত করে। কিন্তু কালের মাত্রাজ্ঞানে অতিসরলীকরণ যেন হানা দেয়। সংকলনের প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশকালের দিকে তাকালে বিষয়টি বোধহয় স্পষ্টতর হয়' (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : নয়)

লেখাবাহুল্য, কালান্তরের প্রায় সব প্রবন্ধই সমসাময়িক কোনো ঘটনায় বা নির্দেশনায় তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিণাম। উর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যায় বসে, অথবা দিব্যচক্ষুতে বিশ্বদর্শন করে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে তিনি বাণী দেন, এমন নয়। কোনো কিছুই তর্কাতীত নয়। এবং এখানে সব রচনাই বস্তু-জগতের মুখাপেক্ষী। (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : এগারো)।

'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত মুক্তবুদ্ধিকে আশ্রয় করেছেন' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ৭২)। নাম প্রবন্ধ 'কালান্তর' রচনার সমকালীন পটভূমি নিয়ে বলা হয়েছে এভাবে– ১৯৩৩ সালের আগের বছরগুলোতে 'রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রযোগে কিছু কিছু করিয়া সব খবরই জানিতে পারেন। সভ্যতা-সংস্কৃতি, শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য– সব কিছুই এক মহাবিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, কবি মর্মে মর্মে ইহা উপলব্ধি করিয়া অশান্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দেশের ও বিশ্বের সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া এই সময়ই তিনি সুবিখ্যাত 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন (পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪০)' (নেপাল মজুমদার, ১৯৯১ : ৩০৯)। স্বকালের এই পটভূমি কমবেশি অন্যান্য প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল। এমনকি 'কালান্তর'-এর পরে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক প্রাধান্য পেয়েছে। 'ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর চরম মত ব্যক্ত হয় ১৩৪০ এবং ১৩৪৮ সালে যথাক্রমে 'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১২০)। এছাড়া হিন্দু-মুসলমান

সম্পর্ক, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার প্রসঙ্গ এবং সংস্কার মুক্তির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনন্য সব বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন রচনায়। প্রধানত রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং স্বাধীনতা ও সংস্কার মুক্তির প্রসঙ্গ এই গবেষণা প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীরকম অসাধারণ সমাজ ও কালসচেতন ছিলেন, তা তাঁর প্রবন্ধসমূহে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের সংজ্ঞানির্মাণের, তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা দানের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের সত্তা এবং সমাজতাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণ মেধা তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্যে লক্ষণীয় বিষয়। জাতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা থেকে তিনি লক্ষ করেছেন পশ্চিমের দেশগুলো রাষ্ট্রতন্ত্র নির্ভর, প্রাচ্যের দেশগুলোর নির্ভর স্থল হলো সমাজ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুস্থ চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন জরুরি এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এই সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেছেন। সমন্বয় ও সামঞ্জস্য এই দুইনীতিকে তিনি তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তায় মান্য করেছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয় 'নেশন সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না, বরং তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন 'ভারতবর্ষীয়' সমাজের ওপর। 'কালান্তরে'র (১৯৩৭) বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত ভাবনার কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশের পরিচয়টি পাওয়া যায়। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৫-৬৭৯)। তবে রাষ্ট্র সম্বন্ধে আরও নানামুখী চিন্তার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় 'রাজা-প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

ভারতবর্ষে ছিল সমাজশাসন। পল্লি শাসিত হতো মাতুব্বরদের দ্বারা; জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপে। শিক্ষা ও চিন্তানুশীলনের জন্য যাত্রার আয়োজন করা হতো। ফলে পল্লি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ইংরেজ এসে এই সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতার মূলে যে 'নেশন' তত্ত্ব আছে তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন ১৯০১ সালে। এদেশের ধর্ম, সমাজ কিছুই নেশনের প্রাধান্যকে স্বীকার করে না বলে তিনি পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতন্ত্রকে পুনর্মূল্যায়ন করলেন স্বদেশের পটভূমিতে। তিনি স্বদেশের জন্য যে নেশন কামনা করেছিলেন তার নাম 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সমাজ ছিল সকলের চেয়ে বড়ো, সেই কল্যাণকামী সমাজকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। গবেষকের মতে, 'মানুষের পুঞ্জীভূত মানবিক গুণের সমাহার দিয়ে সামাজিক মানুষের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের মূল কথা' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৩ : ২৯)

রবীন্দ্রনাথ এই সমাজকে ব্যাপকতর অর্থে পল্লিসমাজ বলেছেন এবং পল্লিসমাজ গঠনই হলো তাঁর সমাজচিন্তার মূল দিক। পল্লি পুনর্গঠন করে তিনি যে একটি অত্যুন্নত রাষ্ট্রাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা সমকালে সম্ভব ছিল না। তিনি অনুভব করলেন যুগধর্মবশত সমাজ পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে, এদেশের সমাজও বদলাচ্ছে। তবে ইউরোপের নকলে পরিবর্তন তিনি চান না, ইউরোপের শিক্ষা চান। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৩-৫৪৮)। প্রবন্ধে প্রচলিত সমাজের নিয়ম রক্ষার বাড়াবাড়িকে আঘাত করে অগ্রসরতার স্বপক্ষে প্রবলভাবে মত দিলেন। সমাজে প্রাণ প্রবাহ বিস্তারের জন্য তিনি যৌবনের পক্ষে

যুক্তিবিস্তার করেছেন এবং কামনা করেছেন 'তারুণ্যের জয় হোক' বলে। নতুন সমাজ নির্মাণে যৌবনধর্মের ভূমিকা 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ 'লোকহিত' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৮-৫৫৩) প্রবন্ধে বলেছেন মানুষের মধ্যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, সমাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ব্যবধানটা 'সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ' দিয়ে ঢেকে দেওয়া। সমাজকে তিনি দুশ্রেণিতে বিভক্ত করলেন, 'ভদ্র সমাজ' ও 'লোকসাধারণ'। আত্মচেতনার অভাবেই লোকসাধারণ উৎপীড়িত হচ্ছে, জমিদার, মহাজন, মনিব, পুলিশ, গুরুঠাকুর, মুক্তার সকলের দ্বারা। এই উৎপীড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণির মধ্যে যোগাযোগ কামনা করেছেন, 'অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই। লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫২)। লেখাপড়ার মাধ্যমে তারা পরস্পরকে বুঝবে ও বুঝাবে। তিনি অশক্তদের শক্তিলাভের প্রয়োজন বোধ করেছেন। অশক্তদের সম্পর্কে বলেছেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫২-৫৫৩)। এ উক্তির কাল ১৯১৪ সাল। এতদিন তিনি সব দায়িত্ব তুলে দিচ্ছিলেন সমাজের হাতে, এবার দিলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার উপরে।

'লড়াইয়ের মূলে' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৩-৫৫৫) প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের সমাজ বিশ্লেষণ করে যুদ্ধের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন– 'প্রভুত্বই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৪)। মানবতাবাদী দৃষ্টিতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ বাঁধত 'শস্ত্রে ও শাস্ত্রে'। কিন্তু বর্তমানে 'বৈশ্যরাজক' যুগের পত্তনে বাণিজ্যের সাথে সাম্রাজ্যের মিলনে বণিক মানুষকে পণ্যে পরিণত করতে চায়।

যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা বিমুখ রবীন্দ্রনাথ 'কর্মযজ্ঞ' (১৩২১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২৯) প্রবন্ধে মানুষের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছেন প্রেমে। ইউরোপের যুদ্ধ তাঁর কাছে যন্ত্রপ্রাধান্যের ফল। ১৩২৪ সালে এ দেশের বিশৃঙ্খলার মূলে তিনি দেখলেন সরকারি যান্ত্রিক শৃঙ্খলাকে। 'ছোটো ও বড়ো' (১৩২৪) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫-৫৬৮) প্রবন্ধে তাই তাঁর কাম্য আনন্দ গৌরব প্রাণময় মানুষ। যান্ত্রিকতা বিদেশি সরকার কর্তৃক আরোপিত বলেই যে নিন্দনীয় তা নয়, দেশের নেতারাও যখন দেশবাসীকে যান্ত্রিকভাবে কাজ করতে আহ্বান করেন, তখনও তিনি তার বিরোধিতা করেন– 'দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বাসিতেছে সেটা শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতি হিসেবে নিন্দনীয়' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৮)। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে' (১৩২৪) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) তা আরও প্রাবল্যের সাথে প্রকাশ করলেন। তিনি দেখলেন, দেশে আত্মবুদ্ধি-চেতনা ও যুক্তির অভাব। সবাই চিরাচরিত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি ইউরোপের মতো ধর্মতন্ত্র ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি কামনা করলেন। 'বাতায়নিকের পত্রে' (১৩২৬) ইউরোপের রাজনীতিকে তিনি বলেছেন, 'শক্তিপূজা' ভারতেও তার ঢেউ লেগেছে। কিন্তু তাঁর কাম্য–

শান্তি ও অমৃত। হানাহানির মূলে তিনি দেখলেন লোভ, 'লড়াইয়ের মূলে' যেমন দেখেছেন প্রভুত্ব। 'যতক্ষণ এই লোভ আছে, ততক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীসকনফারেন্সের এমন শক্তি নেই' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৭৪)

'সত্যের আহ্বানে' (১৩২৮) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) কামনা করলেন মৌমাছি তান্ত্রিকতামুক্তি, চিরাভ্যাসের গণ্ডিচ্ছেদন। তিনি স্বদেশ সৃষ্টি করতে চান 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি', অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পলিটিকেল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকা কাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত : চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান, দ্বিতীয়ত : দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা' করার কথা বলেছেন। 'সমস্যা' (১৩৩০) প্রবন্ধে তিনি স্বার্থপর জাতিচিন্তাকে নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এক করবার কথা। বিদেশি রাজা বড়ো সমস্যা নয়, তাঁর কাছে এদেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো 'ভেদবুদ্ধি'! কিন্তু এ সমস্যার সমাধান দিতে এসে দেখলেন 'অবুদ্ধির সমস্যা'টাই বড়ো। 'সমাধান' (১৩৩০) প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ জানালেন, 'অবুদ্ধির প্রভাবে মন দুর্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন শুধু নয়, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৯)। বিদেশি রাজার প্রস্থান বা চরকা এর সমাধান দেবে না। বুদ্ধির জাগরণে সমাধান ঘটবে। এর জন্য তিনি দরকার বোধ করলেন শিক্ষার।

'চরকা' (১৩৩২) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৮) প্রবন্ধে 'সত্যের আহ্বানের' মতো মনে করেছেন গান্ধীজির চরকা অযোগ্য, বুদ্ধিবিচারেও চরকা পরিত্যাজ্য, ভারতবর্ষের মিলনের উপায় হিসেবে তিনি কামনা করেছেন– ধর্মের ক্ষেত্রে মিলন হতে পারে না, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ঐক্যসাধনও সময় সাপেক্ষ। তাই জীবিকার ক্ষেত্রে মিলপত্তন করতে হবে। স্বরাজ সৃষ্টি বিষয়ে তিনি 'স্বরাজসাধন' (১৩৩২) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৬) প্রবন্ধে পূর্বের মতো আত্মশক্তির উপর জোর দিলেন। স্বরাজ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন আপন দেশকে 'আপনি সৃষ্টি করে তোলবার' অধিকার। চরকার সুতোকাটায় স্বরাজ আসবে না, স্বরাজ আসবে 'প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে' রায়তদের সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি ও ধনহীনতার সম্পর্কে তিনি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন। 'নবযুগ' (১৩৩৯) প্রবন্ধে তিনি মিলনের বাণী প্রচার করলেন, কেননা, মিলনই সভ্যতা। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৪) রবিজীবনীতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ চরকা নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর বিতর্ক-প্রসঙ্গে 'চরকা' প্রবন্ধটি রচনা করলেন' (প্রশান্তকুমার পাল, ২০০৩ : ২৩২)। 'চরকা' প্রবন্ধ লেখার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধে গান্ধীজির আন্দোলনের অপর একটি অবাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

সমাজচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য ভারতবর্ষীয় সমাজ। ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ কী, কী করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে, এ বিষয়ে তিনি অক্লান্ত চিন্তা করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষ চিরদিন চেয়েছে সমন্বয়, মানবতা তাঁর ধর্ম, সৈন্যপণ্য নিয়ে সে বাহাদুরি করেনি। মানবীয় গুণচর্চার অবকাশ নেই বলে তিনি রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারেননি। ভারতীয় সমাজে ত্যাগ, মৈত্রী, কষ্টসহিষ্ণুতা, সমস্ত বৈষম্যের মধ্যেও একটি মিলনসূত্র আবিষ্কারে সদা তৎপরতা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য স্বীকার করেও এসমাজ ঐক্য সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখেছে। এজন্যে এই সুসমন্বিত শ্রেণিবদ্ধ সমাজ রবীন্দ্রনাথের কাম্য। 'চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীন দেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে' (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৬৪)। সমাজকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার মর্মবিন্দু বলে নির্দেশ করেছেন, আর তাকেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার নেশননির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না, এদেশে নেশন ছিল না, যা ছিল তা সমাজ, সমাজ সমস্ত কল্যাণাধার। কবি 'পূর্বদিগন্তের মানুষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেখেছেন যে সমাজশক্তিই এ অঞ্চলের কর্তৃশক্তি, রাষ্ট্র চিরকাল ঐ সমাজেরই অধীন' (ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৫)। দেশের উন্নতি বলতে তিনি বুঝেছেন সমাজের উন্নতি। সমাজ যদি উন্নত হয়, তার মধ্যে যদি আবার প্রাণ জাগানো যায় তাহলে দেশের মুক্তি ঘটবে, এটা ছিল তাঁর উপলব্ধি। বিদেশি শাসন তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, পল্লির পতনই বড়ো সমস্যা। পল্লির উন্নতিবিধান তাঁর স্বদেশচিন্তার মূলকথা। এমনকি গ্রামের শিশুদের শিক্ষার জন্যও তিনি চিন্তা করে গেছেন।(বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০২ : ৬৪)

*রবীন্দ্র-রচনাবলী*র চতুর্দশ খণ্ডে সংকলিত 'পল্লীপ্রকৃতি' (১৩৯৬ : ৩৫১) এবং 'সমবায়নীতি' (১৩৯৬ : ৩৩৩) এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি দেশ সেবায় রাজনীতি থেকে দূরবর্তী, সমাজগঠন তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে এ সমাজ গঠিত হবে নিজেদের সেবা, প্রেম ও মুক্তবুদ্ধির দ্বারা। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, 'রবীন্দ্রনাথ মূলত সমাজচিন্তাবিদ, গৌণত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এবং কোনো ক্রমেই রাজনীতিবিদ নন। তাঁর চিন্তার বিপুল স্থান অধিকার করে আছে সমাজ, সমাজের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ প্রবল, রাষ্ট্রের প্রতি নয়' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ৭৩)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক

'কালান্তর' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথের প্রাজ্ঞ জীবনবোধের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার উচ্চারণ। ১৯১৪-১৯৩৭ সালে লিখিত প্রবন্ধগুলোর বস্তুসম্পদের মূল্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করতে চাইছেন। এর ভেতর ভারতবাসী ও ইংরেজ সম্পর্ক বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'সাহিত্যে, মননে, কর্মে, ধর্মোপলব্ধিতে, সমাজসেবায় যতই বাঙালি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ততই পশ্চিম-পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই সংযোগবাসনা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও জগৎভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য' (শিপ্রা সরকার, ২০০৮ : ২৮)। পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদ না হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উদারমানবতাবাদী রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তাবিদ। এজন্যে তাঁর কাছে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত শাসকের সঙ্গে স্বদেশবাসীর সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

কবি বাল্যকাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বলপ্রয়োগ ও দখলদারি নীতিকে ঘৃণা করে এসেছেন। 'পথ ও পাথেয়', 'সদুপায়', 'দেশহিত', 'ছোটো ও বড়ো', 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ',

'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে তা প্রকাশ করেছেন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশরাজের দেয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করে বীভৎস পাশবিকতার প্রতিবাদ করলেন তিনি। অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামশীল পরাধীনলাঞ্ছিত স্বদেশবাসীর জন্য কাতর রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বে রলাঁ, বারবুস ও গোর্কির মতোই ভূমিকা পালন করেছেন। পক্ষান্তরে গান্ধীজির কাছে ইংরেজের পৈশাচিক দলননীতি ও পাঞ্জাবের ঘটনাবলিকে একান্তই আভ্যন্তরীণ, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হয়েছে। বরং তিনি খিলাফত সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ২৪ নভেম্বর (১৯১৯) সভাপতি হিসেবে নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনের কয়েকমাস পর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ দিবস উপলক্ষ্যে কবি ইংরেজিতে একটি ভাষণ লিখে জিন্না সাহেবকে পাঠান। তার একটি অংশ– 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পাঞ্জাবে এক মহাপাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ...তারা তাদের অভিপ্রায়মতো দুনিয়াটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলেছে' (উদ্ধৃতি, নেপাল মজুমদার, ১৯৯১ : ৪২)। 'কালান্তর' (১৩৪০) প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজের আগমনকে ইতিহাসের বিচিত্র ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'য়ুরোপের চিত্তদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশি জাত কোন দিন এমন করে আসতে পারেনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৮)। য়ুরোপের চিত্তদূত ইংরেজ লেখকের মতে আমাদের জ্ঞানের বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, উনিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতাকামীদের 'প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের অসাধারণ আস্থা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ঊনবিংশ শতকে স্বাধীনতার সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু 'য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে আমাদের 'রাষ্ট্রজাতিক রথ' এবং এতে সহায়তা করবে ইংরেজ। কিন্তু আজ ইংরেজ শাসনের প্রধান শর্ত 'ল' এবং 'অর্ডার'– বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। অতএব স্বপ্নভঙ্গ হলো। তিনি যে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলন কামনা করেছেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম' (১৩১৫) প্রবন্ধে ইউরোপের যে আলোক শিখার প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছেন, বাস্তবে তাকে দেখলেন : 'য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। তিনি দেখলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ কর্তৃক আফিমক্রিয়ায় চীনের ধ্বংস, পারস্যে অত্যাচার, কংগোতে অত্যাচার, আমেরিকায় নিগ্রোদের লাঞ্ছনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রত্যক্ষ করলেন কোরিয়া, চীন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, তুরস্ক ও ইউরোপের অত্যাচার। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তিত হলো– 'একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইতালি-জার্মানি সর্বত্র বর্বরতা তাঁকে একটি বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিলো– 'মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২) তিনি ইংরেজের পীড়নে হাতজোর করে 'দিল্লীশ্বরো' বা 'জগদীশ্বরো' বলতে অনিচ্ছুক, এজন্যে মাথা তুলে ইংরেজকে বিচার করার কথা ব্যক্ত করে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনেছেন। আসলে 'সাহিত্যের ইংরেজ মহান উদার কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অমানুষিক' (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৭৬)। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, ইংল্যান্ড ভারতকে দেখে রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির

মতো, ভারতের হৃদয় দেখে না। বরং সরকার অর্থনৈতিক শোষণে বেশি উৎসাহী। 'রাজনীতির দ্বিধা' (১৩০০) প্রবন্ধে কবি বলেছেন– শাসক চরিত্রের দুটি রূপ– স্বদেশে (লন্ডনে) সংগীত শিল্পকলা শিষ্টাচার; বিদেশে (ভারতে) উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য। ভারতবর্ষে শাসক ইংরেজ অত্যাচারী, তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। তবে বিলেতের ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণ ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১) (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪২-৬৪৭) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ইংরেজ প্রতিনিয়ত এদেশবাসীকে অপমান করছে। শিক্ষিতরা প্রতিকারের চেষ্টা করছে। এজন্য জাতির ঐক্যের প্রয়োজন। 'সুবিচারের অধিকারে' (১৩০১) এসব কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। 'ছোটো ও বড়ো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫) কিছু অংশ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করলেও রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে ভারতবাসী ও ইংরেজের সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজদের দু'শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। একদল প্রবলতার পক্ষে, অপরদল মনুষ্যত্বের পক্ষে। প্রথম দল ছোটো রূপে বাস করেন বিলেতে। ভারত শাসন করছে প্রবলতার পক্ষাবলম্বী দল– অর্থাৎ ছোটো ইংরেজ। শাসকরূপে এদের চরিত্র হলো ভারতবাসীর উপর আমলা সম্প্রদায়ের মত কর্তৃত্ব করা। কারণ বড়ো ইংরেজ সাগর পারে ব্যবসা করে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারতকে স্পর্শ করে না; ছোটো ইংরেজ এদের মাধ্যমরূপে কাজ করে।

বড়ো ইংরেজের খবর ভারতবাসী জানে বইয়ের পাতার মাধ্যমে, বড়ো ইংরেজ ভারতবর্ষকে জানে অফিসের দপ্তর ও জমাখরচের খাতার মাধ্যমে। তবু লেখকের বিশ্বাস 'বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে' আর 'বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬০)। তারা ন্যায়, সভ্যতা, স্বাধীনতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী; ছোটো ইংরেজ তাঁদের বিপরীত।

রবীন্দ্রনাথ ছোটো ইংরেজের সঙ্গে তাঁর একটি বিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, 'ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর'। অথচ তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপর 'দাবি' করেছেন। অথচ এই ইংরেজ আমাদের ভাষা জানে না, 'তাদের কাছে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সত্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়'।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসনপ্রণালির সমস্যা উদ্‌ঘাটন করেছেন। দেশের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে দেশের মানুষের দায়িত্বের যোগ ও শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের মমত্ব কামনা করে তিনি সেই সমস্যার সমাধানও কামনা করেছেন। পরিশেষে তিনি বর্তমানের ইংরেজ শাসনের চেহারা যাই হোক না কেন পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের প্রত্যাশা করেছেন। তিনি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন : 'আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে; অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৮)। 'ছোটো ও বড়ো'প্রবন্ধে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন কাম্য হলেও রবীন্দ্রনাথ 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৩২৪) প্রবন্ধে লক্ষ করলেন, ইংরেজ শাসনের দেড়শ বছরেও উভয়কে মেলাতে পারেনি। পশ্চিমের বর্বরতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি ইউরোপকে মৃত্যুশেলবিদ্ধ আখ্যা দিলেন। ইউরোপের কোনো দানের ক্ষমতা নেই বলে তিনি চাইলেন– 'ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব

না– কিছুতেই না। স্বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৭)। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিকৃত চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ পেল 'হিজলী ও চট্টগ্রাম' (১৩৩৮) প্রবন্ধে। হিজলী কারার দুজন রাজবন্দিকে রক্ষীরা খুন করলে রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন– 'বিদেশী রাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭২)। রাজবন্দির হত্যাকাণ্ড এবং বলপূর্বক সাধারণের কণ্ঠরোধ করা রাজাপ্রজার সুসম্পর্কের জন্যে ইতিবাচক দিক নয়। এজন্যে তিনি গবর্মেন্ট এবং দেশাবাসীকে অনুরোধ করেছেন– 'অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডবনৃত্য এখনি শান্ত হোক' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৩)। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে 'প্রচলিত দণ্ডনীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। প্রচলিত দণ্ডনীতিতে তিনি দেখেছেন মানুষের প্রতি অপমান এবং 'আমাদের স্বদেশীয় অপরাধীর প্রতি অবজ্ঞা'র দৃশ্য। তাঁর ভাষায়– 'আমাদের দেশেই বিধিনির্দিষ্ট দণ্ডপ্রয়োগের অতিরিক্ত অপমান-প্রয়োগ সমস্ত জাতকে লাঞ্ছিত করে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৭)। এর মূল কারণ ভারতবাসীর ইংরেজের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন।

চীনযাত্রা কালে হংকং বন্দরে চীনা ফেরিওয়ালাকে বেণী ধরে টেনে লাথি মারার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতে চেয়েছেন মানুষের অবজ্ঞা এবং তার আনুষঙ্গিক নিষ্ঠুরতা স্থায়ীভাবে এদেশের আবহাওয়াকে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে। অথচ অপরাধীকে দণ্ড দেবার সভ্যনীতি আমরা ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই ইংরেজ আজ বন্দিদের 'উপরে শাসনের ঝাল-মসলা প্রচুর করে তুলে তার তীব্রতা বাড়িয়ে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৮)। তুলেছে। লেখক একে সভ্যনীতি বলতে নারাজ। রবীন্দ্রনাথ দণ্ড প্রয়োগকে মান্য করেন কিন্তু অতিকৃত দণ্ড প্রয়োগকে বলেন বর্বরতা। এজন্য তিনি হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে পরিশোধ করতে না বলে সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের ধারায় বিচারের কথা বলেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি নির্জনকারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসনকে সমর্থন করেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং দৃঢ়ভাবে বলেছেন– 'যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধির পদে উচ্চ শাসন মঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করব' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৭৯)। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সর্ববিষয়ে উন্নতি চেয়েছেন। এজন্যে ইংরেজের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীরও সেবা কামনা করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে ইংরেজের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। স্বদেশবাসীকে নিয়ে তিনি উন্নত মহৎ দেশের স্বপ্ন দেখেছেন। এজন্যই প্রাচ্যের কুটিরে মহামানবের আবির্ভাব গান গেয়েছেন। কবি ভাবগত ক্ষেত্রে ইংরেজের অগ্রগতি গ্রহণ করলেও ভারতে ইংরেজ প্রশাসনের পীড়নের বিপক্ষে ছিলেন। কারণ ইংরেজরা এদেশে শাসন করতে এসে কোনো মানবিক সম্পর্কের বন্ধন গড়ে তোলে নি যা মুসলমান শাসন আমলে হয়েছিল। এজন্যে প্রীতির অভাবে ইংরেজকে নির্দয় করেছে। ফলে দেশের মানুষকে অবাঞ্ছিত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে, মনুষ্যত্বের অপমান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর সপক্ষে থেকে নির্ভীকভাবে ইংরেজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধতা করেছেন।

'কালান্তর' ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথ কীরকম অসাধারণ সমাজ ও কালসচেতন ছিলেন, তা তাঁর প্রবন্ধসমূহে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। 'কালান্তর' (১৩৪০) প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষীয় সমাজ, ইংরেজদের আগমন এবং

সমকালীন রাজনীতির বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষে ছিল সমাজ শাসন। পল্লির চণ্ডীমণ্ডপেই ছিল সমস্ত কিছুর বিকাশের ধারা। কিন্তু চিন্তানুশীল, গল্প-গুজব, তাস-পাশা, দিবানিদ্রা ইত্যাদির সংকীর্ণ পরিসরের বাইরে 'মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্‌দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, ...এ আমাদের গোচর ছিল না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৭)। ভারতবর্ষে বাইরে থেকে প্রথম আগমন ঘটে মুসলমানদের, কিন্তু তারাও 'আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ'। মূলত ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমাদের মধ্যে নবযুগের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, 'য়ুরোপের চিন্তাদূত রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৮)। তারা আমাদের দেখিয়েছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ। সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা নিয়ে এলো ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ। এতে ন্যায়ের কথা আছে, আছে কোনো বিচারে অন্যায়কারীর দণ্ড লঘু হবে না। তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে 'আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ, শুনতে পেয়েছিলাম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা, দেখেছিলাম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৯)

এভাবে ইংরেজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বিশ্বের সাথে, শিখিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে। কিন্তু এসমাজ বড়ো কঠিন সংস্কারের শিকড়ে বাঁধা। শিক্ষিতজনের অনেকে 'রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করবার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে', অন্যদিকে আবার তারাই ধর্মনির্ভর ও ভাগ্যনির্ভর হয়ে 'আত্মাবমাননা স্বীকার' করে।

তবু প্রতিদিন আলোর দিকে আমাদের যে অগ্রযাত্রা তাতে রয়েছে 'য়ুরোপের প্রভাব'। বরং যেখানেই আমরা ইউরোপীয় শিক্ষা এড়িয়ে চলতে চেয়েছি সেখানেই ঘটেছে 'আমাদের পরাভব'। রবীন্দ্রনাথ এ সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন– 'এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরাজনীতির প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, 'বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতির রথ চলবে সামনের দিকে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। এবং এতে সহায়তা করবে ইংরেজ। কিন্তু দেখা গেল ইংরেজ শাসনের প্রধান শর্ত "ল' এবং 'অর্ডার' বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। ফলে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন-উৎপাদন সমস্তই তলিয়ে গেল 'ল' এবং 'অর্ডারে'র প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। ... নবযুগের সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ। তিনি যে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলন কামনা করেছেন, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক শিখার প্রশংসায় তিনি মুখর হয়েছেন, বাস্তবে তাকে দেখলেন, 'য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪১)। তিনি দেখলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইংরেজ কর্তৃক কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড এক সঙ্গে বর্ষিত হলো চীনের মর্মস্থানের উপর, পারস্যে অত্যাচার, কংগোতে ধ্বংসক্রিয়া, আমেরিকায় নিগ্রোদের লাঞ্ছনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন কোরিয়া, চীন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, তুরস্ক ও ইউরোপের 'নির্বিচার নিদারুণতা'। তাঁর বিশ্বাস পরিবর্তিত হলো– 'একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে

উঠছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইতালি জার্মানি সর্বত্র 'উন্মত্ত দানবিকতা' তাঁকে একটি বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিলো– 'মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা?' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪২)। ইউরোপের এই পাশবিকতায় রবীন্দ্রনাথ হাতজোর করে 'দিল্লীশ্বরো বা জগীশ্বরো বা' বলতে অনিচ্ছুক। বরং মাথা তুলে তিনি তাদের বিচার করার কথা ভেবেছেন এবং অভিসম্পাত করেছেন 'অশ্রদ্ধেয়' বলে।

'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তরে'র মতো ইংরেজের প্রতি তাঁর আস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দেখিয়েছেন, যে 'দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪২)। অথচ ভারতের মতো 'অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪২)।

ইংরেজের যন্ত্রশক্তির ব্যবহার থেকে ভারত বঞ্চিত। অথচ জাপান যন্ত্রচালনার দ্বারা সম্পদবান হয়ে উঠেছে সর্বতোভাবে। ভারতবর্ষের এই নিশ্চলতার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজকে দায়ী করেছেন– 'ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোন অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৩)

রবীন্দ্রনাথ জাপানে যেমন দেখেছেন 'স্বজাতির মধ্যে সভ্য শাসনের রূপ', তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ায় তিনি দেখেছেন শিক্ষাবিস্তারের 'অকৃপণ অধ্যবসায়' এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার 'শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা'। আসলে 'সভ্যতার সংকট'-এ 'কবি চিরদিনই মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর– তাহার অপরাজেয় সংগ্রামী-সত্তার জয়গান করিয়াছেন' (নেপাল মজুমদার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯১ : ২৮৭)। কিন্তু ইংরেজের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে' রাখার প্রবণতা। চীন, স্পেন যে প্রবণতার বিষে জর্জরিত। অথচ তিনি একসময় যখন ইংরেজকে 'মানব হিতৈষীরূপে' দেখেছেন তখন ভক্তি করেছেন। প্রথমে ইংরেজের ওপর কবির যে অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, কালক্রমে তা ভেঙে যায়। প্রথম বিলাতবাসে আকৃষ্ট কবি দ্বিতীয়বার বিতৃষ্ণ। ব্রিটিশদের বিষয়ে ১৮৯১ সালে যে সংশয় শুরু হল তা 'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১) চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৭৬)।

বস্তুত মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সর্ববিষয়ে উন্নতি কামনা করেছেন। 'স্বদেশের জন্যে কেবল স্বাধীনতা চাননি, চেয়েছেন সর্ববিষয়ক উন্নতি' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১৪৫)। এজন্যে ইংরেজের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনগণের সেবাও তিনি প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ইংরেজদের 'নখদন্ত বিকাশে' মানবাত্মার অপমানের ফলে তিনি তাদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের 'দারিদ্রলাঞ্ছিত কুটিরে' মহামানবের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছেন এভাবে–

ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
(*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৫)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সবকিছু ধারণ করতে হবে দেশীয় ঐতিহ্যের মূল্যবোধ দিয়ে। প্রাচ্যের সাধনা আত্মার সাধনা, সত্যের সাধনা। পাশ্চাত্যের সাধনা ধনের। তাদের মধ্যে রয়েছে আগ্রাসী স্বভাব। তিনি মনে করেছেন আত্মার চর্চা ও জ্ঞানের চর্চার সেতুবন্ধন ঘটালে উন্মেষ ঘটে মানবতার। যে আত্মার চর্চা অর্থাৎ মানবতার অভাবে ইংরেজ 'বিভিষিকা বিস্তার করতে উদ্যত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৭৪৪)। মনুষ্যত্বের এই অপমান থেকে উদ্ধার করে আলোর পথ দেখাবে পূর্বদেশের বৃদ্ধ। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় মানবতার সারসত্তার নবজন্ম চিত্রিত হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অভিব্যক্ত হয়েছে যে, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনাই স্বাধীনতার সাধনা। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, অন্য জাতি এসে দেশ শাসন করবে সেটাই কেবল পরাধীনতা নয়, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলেও তা পরাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা চিন্তায় তাঁর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনার প্রসঙ্গ এসেছে এবং স্বাধীনতার কথা তিনি যখন বলেছেন, তখন ইংরেজ শাসন চলছিল, কাজেই তাঁর আলোচনায় তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। 'কালান্তর'-এর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', 'ছোটো ও বড়ো', 'বাতায়নিকের পত্র', 'সত্যের আহ্বান' ইত্যাদি প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুচিন্তিত ভাবনা প্রকাশ করেছেন। 'সম্প্রদায়-ভেদ ও জাতিবর্ণ-ভেদ, অশিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও সনাতনী প্রথার অন্ধ দাসত্ব, জঘন্য স্বার্থবুদ্ধি ও ঈর্ষা-দলাদলি-চক্রান্তের নীচতা থেকে মুক্তিই রবীন্দ্রনাথের অভিলষিত প্রাথমিক স্বাধীনতা' (ড. ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৪)

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন স্ব-অধীনতা। নিজেদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরতা হচ্ছে পরাধীনতা। বিদেশি রাজা বড়ো কথা নয়। পরাধীনতা অর্থে তিনি পরমুখাপেক্ষিতা বুঝিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন আত্মশক্তিতে সুগঠিত হলে তবেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। 'আত্মশক্তি' (১৩১২) প্রবন্ধে তিনি আত্মশক্তিসাধনের কথা বারবার বলেছেন। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৩-৫৪৮) প্রবন্ধে তিনি দেখালেন তৎকালীন সময়ে 'স্বদেশ প্রেমের বান' ডেকেছিল 'বান শব্দটার মধ্যে একটা প্রাণ প্রবাহ আছে' কিন্তু পরস্পরের ভিতর ব্যবধানের প্রাচীর থাকায় সেই 'বান'টা মিলনের পক্ষে খুব একটা কাজ করেনি। এই প্রবন্ধে সামাজিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) প্রবন্ধে তা আরো প্রাবল্যের সাথে প্রকাশ করলেন। তিনি দেখালেন দেশে আত্মবুদ্ধি, চেতনা ও যুক্তির অভাব। সবাই চিরাচরিত নিয়মনিষ্ঠ। তিনি ইউরোপের মতো ধর্মতন্ত্র ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি কামনা করলেন। তিনি সমকালের মানুষের মানসিকতা ভেবে প্রায় প্রায় শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে

দেখিয়েছেন– 'অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৫৮)। জ্ঞানকে জীবনের জন্য আপন করতে হবে। দেবতা জেনে সরস্বতীর চরণে ফুল জল দিয়ে প্রণাম করলেই চলবে না, জ্ঞানে যা পাই, যাকে সত্য বলে জানি তাকে বাস্তবে জীবনের কর্মের সাথে গ্রহণ করলেই প্রকৃতভাবে ঘটে জীবনের উত্তরণ, আত্মশক্তি সাধন।

'ছোটো ও বড়ো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন স্বাধীনতার জন্য কোনো 'শর্ট-কাট' পথ নেই। এ প্রবন্ধে তিনি হোমরুল সমর্থন করেছেন, অথচ তিনি মনেপ্রাণে এ স্বাধীনতার পক্ষে নন। কিন্তু ইংরেজরা হোমরুল দেয়নি। তারা এদেশের সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যেহেতু সমাজের শাসন নষ্ট হয়ে গেছে এখন আছে বন্ধন, আচারসর্বস্ব কতগুলো নিয়ম। ধর্মের যে আচার-বন্ধন তা মানুষের মনকে বিবেচনা করে না, বাধা সৃষ্টি করে সামাজিক মিলনে। কবির মতে ধর্ম যতদিন আচার সর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিলন সম্ভব নয়। 'আমাদের নালিশটাই যে এই কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই'– শাসনকর্তা ইংরেজ, রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে ছোটো ইংরেজ বলে দেখেছেন, এই ছোটো ইংরেজদের সাথে বিরোধে 'দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল' তখন তিনি আশা করেছিলেন আমাদের সমস্ত 'যুগসঞ্চিত অপরাধ', 'দুঃসহ নৈরাশ্য' বীভৎস অন্ধকার কোণ ছেড়ে পালাবে। সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা'। 'পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকে' আশ্রয় করে দেনাপ্রীতির নামে সমস্ত দেশকে কলঙ্কিত করেছে– এর মধ্যে মহৎ আত্মত্যাগের পরিচয় যে ছিল না তা নয়। কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তিনি এভাবে– '...পোলিটকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়ে বাধাগ্রস্ত করিব না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৪)। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়– সংকটময় দুর্গমপথ অতিক্রম করে দেশের কল্যাণ করতে পারে 'দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৪)। 'বাতায়নিকের পত্র' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৬৮) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন 'যে দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসানুদাস করে রেখেছে, সে দেশে কর্তৃত্বের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮২)। ধর্মের আচারমগ্নতা এদেশের মানুষকে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৃথক করে রেখেছে। মূঢ়তায় জড় হয়ে থাকার কারণে এদের কোনো ব্যক্তিগত অভিরুচি নেই, স্ব-ইচ্ছা নেই, স্ব-অধীনতা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৩)। সাধনার দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা অন্তরের মূলগত এই আচ্ছন্নতা দূর করতে পারলেই স্ব-অধীনতা লাভ সম্ভব।

'সত্যের আহ্বান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সস্তায় বাজিমাত হয় না। 'মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হবে' এবং এই লক্ষ্যে ধ্যান, কর্ম ও সত্যের সম্পৃক্তির মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করতে হবে। স্বদেশ সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর অভিমত– 'দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এই জন্য যে

দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৭)।

এই সৃষ্টি সাধিত হয় 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি' অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পোলিটিকাল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকাকাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত, চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান; দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? মহাত্মাজি বলেছেন– প্রেমের সত্যে আমরা এক হব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিমত, প্রেমই একমাত্র সত্য নয়, প্রেমের সঙ্গে বুদ্ধির সত্য যুক্ত না হলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হবে না। (সত্যের আহ্বান, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৯৫-৫৯৬) তাঁর মতে, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা, প্রেম দ্বারা, কর্ম দ্বারা দেশকে গড়ে নিতে হবে, আত্মা দিয়ে জানতে হবে।

'সমস্যা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৯৭) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের সত্য মিলনে 'অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা'। অবুদ্ধি হলো পরাধীনতা। আচারসর্বস্বতা, অহেতুক অকল্যাণের ভয় অবুদ্ধির প্রকাশ। 'সমাধান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৩৯) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বুদ্ধিরূপের কর্ষণ করলেই সর্বজনীন স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। অর্থাৎ কোনো ভৌগোলিক পরিসরের নয় 'রাষ্ট্রিক বা সামাজিক' ভাবে স্বাধীনতা পেতে হবে। এর মূলে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্তরিকভাবে ভেবেছেন। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজে' সমাজোন্নয়নের পদ্ধতি দান করেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বিদেশি শাসন তার কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, অবুদ্ধিই ছিল বড়ো সমস্যা। জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে মনের মধ্যে যে অবরোধ আছে তা থেকে মুক্ত হলেই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মনের অন্তঃপুরে অন্ধকারের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টাতেই সম্ভব দেশ ও সমাজের সত্যিকার স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

অন্ধসংস্কার মুক্তি

জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই সমাজ ও দেশের যথার্থ মঙ্গল বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯১৪-১৯৩৭ সালে লিখিত 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলোর বস্তুসম্পদের মূল্য বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, অন্য জাতি এসে শাসন করবে সেটাই কেবল পরাধীনতা নয়, জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলেও তা পরাধীনতা। তিনি বলেছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্ধসংস্কার থেকে

মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই সমাজ ও দেশের যথার্থ মঙ্গল সম্ভব– এর মূলে তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। 'কালান্তর', 'লোকাহিত', 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা' এবং 'শিক্ষার মিলন', 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭) ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

'কালান্তরে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' (১৩১২) ও 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) নামে প্রবন্ধ লিখেছেন। 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে তাঁর লক্ষ্য সমাজ গঠন এবং তিনি দেশসেবায় রাজনীতি থেকে দূরবর্তী। তিনি বলেছেন এ সমাজ গঠিত হবে নিজেদের সেবা, প্রেম ও মুক্তবুদ্ধি দ্বারা। 'লোকহিত' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪৮) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, শিক্ষার দ্বারা সংঘবদ্ধ হলে মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার করায়ত্ত করতে পারবে। ধর্মের দোহাই দিয়ে জমিদারকে তার কর্তব্য করতে বলা, মহাজনকে সুদ কমাতে বলা আর পুলিশকে অন্যায় করতে বারণ করা নিতান্ত দুর্বলতার নামান্তর। আমাদের বাস্তবঘনিষ্ঠ সামাজিক জীবনে ধর্মের দোহাই দিয়ে সবকিছুর শাসন চলে না। সামাজিক এই সমস্ত বাধা অতিক্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন সকল মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে। জনবিচ্ছিন্ন থেকে তাদের কল্যাণের চেষ্টা করা বা নাইট স্কুলে পাঠিয়ে শিক্ষাদান হয় না। শিক্ষাটা হতে হবে সর্বজনীন, আদান-প্রদানের সহজ সম্পর্কের নিবিড়তায়। 'তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই। লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫১-৫৫২)

শিক্ষার মাধ্যমেই 'আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে' পাওয়া সম্ভব। এই 'বৃহৎ মানুষ' হচ্ছে সবকিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা মানবতা। কাজেই নিয়মের ভেতর, শিক্ষার ভেতর, এই বৃহৎ মানবতার বোধ থাকতে হবে এবং এই মানবতার বোধ বাইরের মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

'সত্যের আহ্বান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৫) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সস্তায় বাজিমাত হয় না। 'মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করে নিতে হবে' এবং এই লক্ষ্যে ধ্যান, কর্ম ও সত্যের সম্পৃক্তির মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রসারিত করতে হবে। স্বদেশ সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর অভিমত– 'দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তি সম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে এই জন্য যে, দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮৭)। এ সৃষ্টি সাধিত হয় 'হৃদয়বৃত্তি', 'বুদ্ধিবৃত্তি', 'ইচ্ছাশক্তি' অর্থাৎ মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের দ্বারা। এই ত্রিশক্তির যোগই পূর্ণশক্তির যোগ, পলিটিকেল বা ইকনমিক যোগ, তাঁর কাছে, পূর্ণশক্তির যোগ নয়। যোগ সাধনের অধিকার তিনি মহাত্মাজির মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর আহ্বান সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তাঁর চরকা কাটা নীতি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি। যে কালে কলে কাপড় তৈরি হচ্ছে সেকালে চরকা কাটা অর্থহীন। আবার কাপড় পোড়াবার নীতিরও রবীন্দ্রনাথ বিরোধী ছিলেন দু'কারণে। প্রথমত, চোখ বুজে হুকুম মানার বিপত্তি থেকে তিনি দেশকে উদ্ধার করতে চান; দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোকের যেখানে কাপড় নেই সেখানে তিনি কার কাপড় পোড়াবেন? (এ গবেষণা প্রবন্ধে

আগেও অন্য প্রসঙ্গে এই একইকথা বলা হয়েছে)। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সবচেয়ে বড়ো ও জরুরি লড়াই হচ্ছে মূঢ়তার বিরুদ্ধে। যদি শিক্ষার সাহায্যে সবকিছু বুঝে নিতে না পারা যায় তাহলে মূঢ়তা আমাদের গ্রাস করবে।

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা' করার কথা বলেছেন। 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি স্বার্থপর জাতির নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এক করবার কথা। তাঁর মতে এ দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো 'ভেদবুদ্ধি'– 'ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)

এই সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে তিনি দেখেছেন মানুষের সত্যমিলনে 'অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা'। অবুদ্ধি হলো পরাধীনতা। আচার সর্বস্বতা, অহেতুক অকল্যাণের ভয় হলো অবুদ্ধির প্রকাশ। শাস্ত্রের সবকিছু মানা যাবে না, শাস্ত্রকে বিচার করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। স্বাধীন জ্ঞানশক্তি দিয়ে বুদ্ধির চাষ করতে হবে। 'সমাধান' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৯-৬১১) প্রবন্ধে বলেছেন, গুরু, পুরোহিত, বিধানদাতার কথায় থেমে থাকা যাবে না। বুদ্ধিরূপের কর্ষণ করলেই সর্বজনীন স্বাধীনতা। অর্থাৎ কোনো ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয় 'রাষ্ট্রিক বা সামাজিক'ভাবে স্বাধীনতা পেতে হবে। এর মূলে রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বুদ্ধির চর্চাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। বিপদমুক্তির জন্য অলৌকিক পন্থা ভাবনা, ভাগ্য নির্ভরতা, গুরুর চরণ বন্দনা ইত্যাদিতে রয়েছে কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা। আত্মবুদ্ধির মুক্তি যদি আসে তাহলেই সম্ভব সমাজ ও দেশের কল্যাণ। তাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত শিক্ষাকে এড়িয়ে কোনো 'শর্টকার্ট' পথ নেই।

'শিক্ষার মিলন' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩০৩–৩১৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্ব ব্যাপারকে আয়ত্ত করার পরম কৌশল বিজ্ঞান চর্চার সিদ্ধিলাভে নিহিত। বুদ্ধি যদি ভীরু হয়, যথার্থভাবে চর্চিত হয়ে ঔজ্জ্বল্যলাভ না করে, তীক্ষ্ণ না হয় তাতে দুর্বলতা থাকে, বিশ্ব নিয়মকে জানা যায় না। বিশ্ব নিয়মকে বুঝবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা চলছে যুগ যুগ ধরে, বিজ্ঞানীরা যে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেছেন তা নয়। বিশ্বের চলার ছন্দে রয়েছে ত্রুটিহীনতা, আমাদের বুদ্ধি দিয়ে এই বিশ্বনিয়মকে জানতে হবে। 'বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে, এই জন্যে এই নিয়মের পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত– এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩০৫)।

পশ্চিমদেশে পলিটিক্যাল শাসনে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে বুঝেছে 'রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়' প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এই নিয়মের সম্মতির সম্পর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেছেন স্বরাজটা আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। রাজার বদল হলেই স্বরাজ আসে না। ভারতবর্ষের সমস্যা শিক্ষাতে এরা পিছিয়ে। অতীতের বিদ্যার আস্ফালন না করে পাশ্চাত্যের অগ্রসর বিদ্যার বিষয়টিকে আত্মস্থ করতে হবে। পাশ্চাত্যে আছে বিজ্ঞানের চর্চা, প্রাচ্যে আছে দর্শন– এদুয়ের মিলিত রূপেই মুক্তি। 'ন্যাশনালিজম সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় সামরিক শক্তি ভরণপোষণের ঘোর বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ' (অশোক সেন, ১৪২১ : ১৪৯)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশনালিজম সত্য নয়'। ... দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজম। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*,

ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩১৪)। তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বমুখিতার প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বমুখিনতার শিক্ষা আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বিষয়। এজন্যে তিনি 'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে' অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেছেন। বিদেশি অতিথির আগমনে জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদানে পূর্ণতা পাবে মনুষ্যত্বের।

'কালান্তর' প্রবন্ধে তিনি ইউরোপের শিক্ষার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। ইউরোপ সম্পর্কে তাঁর অভিমত 'প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৩৯)। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই আমদের মধ্যে নবযুগের সূচনা হয়। ইউরোপের চিত্তদূত ইংরেজ আমাদের দেখিয়েছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।

পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয়, সাহিত্যের মাধ্যমে তারা নিয়ে এল ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ, এতে ন্যায়ের কথা আছে। কোনো বিচারেই অন্যায়কারীর দণ্ড লঘু হবে না। কিন্তু এ সমাজ বড়ো কঠিন সংস্কারের শিকড়ে বাঁধা। 'পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়েনি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ইংরেজ শিখিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতে। 'তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৪০)। ইউরোপের যে নবযুগ, ক্রম-অগ্রযাত্রা তা এসেছে শিক্ষার গুণে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন 'সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা' করতে। 'সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে... মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব– নবযুগের উদবোধন করে আমরা জরামুক্ত হব' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৩১৬)।

শিক্ষার সাধনার দ্বারা এদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথ নারীদেরকে বলেছেন হৃদয়কে মুক্ত করতে, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করতে, তাহলে নারীও হয়ে উঠবে সৃষ্টিশীল।

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনিয়মের কথা বলেছেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধেও বিশ্বনিয়মকে বলেছেন 'যথাতথ'। 'বিশ্বের আগোগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে'– এই বৃহৎ নিয়মকে জানার মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের চর্চা, 'বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার' ক্রম-অগ্রসরতার আশ্রয়। তিনি সমকালের মানুষের মানসিকতা ভেবে প্রায় প্রায় শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন– 'অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬৪৭)। জ্ঞানকে জীবনের জন্য আপন করতে হবে। দেবতা জেনে সরস্বতীর চরণে ফুল জল দিয়ে প্রণাম করলেই চলবে না, জ্ঞানে যা পাই, যাকে সত্য বলে জানি তাকে বাস্তবে জীবনের কর্মের সাথে গ্রহণ করলেই প্রকৃত ভাবে ঘটে জীবনের উত্তরণ।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে ভেবেছেন। ১৯০৪ (১৩১১) সালে 'স্বদেশী সমাজে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন, ১৩৩২ : ৫৫-৬৭) সমাজোন্নয়নের পদ্ধতি দান করেন, এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে বারবার ব্যাখ্যা করেছেন। বিদেশি শাসন তাঁর কাছে বড়ো সমস্যা ছিল না, অবুদ্ধিই ছিল বড়ো সমস্যা। জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে মনের মধ্যে যে

অবরোধ আছে তা থেকে মুক্ত হলেই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মনের অন্তঃপুরে অন্ধকারের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে অন্ধসংস্কার থেকে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব দেশ ও সমাজের সত্যিকার মঙ্গল।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

কালান্তরে যে ছ'টি লেখায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ ও অভিমত ক্রম অনুযায়ী প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো– লোকহিত (ভাদ্র, ১৩২১), ছোটো ও বড়ো (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪), সমস্যা (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), হিন্দু-মুসলমান (শ্রাবণ, ১৩২৯), হিন্দু-মুসলমান (শ্রাবণ, ১৩৩৮), হিজলী ও চট্টগ্রাম (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)। এই প্রসঙ্গে সনৎকুমার সাহা তুলে দিয়েছেন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ (সনৎকুমার সাহা, ২০১৭ : উনিশ-বিশ)

১. বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড, ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই। ('লোকহিত')

২. এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ, সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না। ('ছোটো ও বড়ো')।

৩. যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। ('সমস্যা')

৪. ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের একদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে।... হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। ... অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কাটিয়ে বেরিয়ে আসব,...। ('হিন্দু-মুসলমান–১')

৫. যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য...

... বিশেষ ধর্মের আদি প্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্যে, তাকে লোভ দ্বেষ অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে, এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়। মেরেছে প্রাণে, মানে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে, মানুষের মহোকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার ধর্মের দামে। হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়।... ধর্ম আমাদের মেলাতে পারেনি, বরং হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাশ্বত বলে পাকা করে দিয়েছে।...

ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালোরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়।... ('হিন্দু-মুসলমান-২')

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখলে বোঝা যায়, 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলোতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত নিঃসন্দেহে এখনও পর্যন্ত মূল্যবান। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত গভীর, আন্তরিক সদিচ্ছাপূর্ণ চিন্তা করেছেন। তিনি প্রখর দৃষ্টিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাদের মিলন না হবার কারণসমূহ অবলোকন করেছেন এবং সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কেও তাঁর সৎ মন্তব্য ছিল। সমকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে 'কালান্তরে'র 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭), 'বাতায়নিকের পত্র' (১৯১৯), 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯২২), 'সমস্যা' (১৯২৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও গণসংযোগের প্রশ্নে' অংশে নেপাল মজুমদার জানিয়েছেন, দাঙ্গা দেখে তিনি বিচলিত হয়ে লেখেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (সমূহ গ্রন্থভুক্ত) প্রবন্ধটি। (নেপাল মজুমদার, ১ম খণ্ড, ১৯৯১ : ২৮৮-২৯৫)

'সুবিচারের অধিকার' (১৮৯৪) প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের জন্য সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিকে দায়ী করেছেন তিনি। তৎপূর্বে 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কংগ্রেসে মুসলিম সম্প্রদায় যেন যোগ না দেয়, সে প্ররোচনা যুগিয়েছে সরকার। তবে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১০) রচনা থেকে ইংরেজকে বিরোধের মূল বললেও নিজেদের দোষত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি। 'এতে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের আসল কারণটি কোথায় তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এ বিচ্ছেদ হল জাতীয় পাপ এবং এই পাপের নিরাকরণ না করে জাতীয় আন্দোলনে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না' (ড. ক্ষুদিরাম দাস, ১৯৫৮ : ১৯৮)।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে তারপর সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে কবি 'ছোটো ও বড়ো' (১৯১৭) প্রবন্ধে ঘটনার জন্য ধর্ম ও সরকারের উসকানিকে দায়ী করেছেন। আবার ১৯৩০ সালে দাঙ্গার পিছনে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও অশিক্ষা আবিষ্কার করেছেন তিনি। মূলত ভারতবর্ষে সরকারি ভেদনীতির কারণে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (১৩০০), 'ইংরেজের আতঙ্ক' (১৩০০), 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১) প্রবন্ধে সরকারের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিকে বিরোধের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারের হিন্দুদের দমন করে মুসলমানদের সহযোগিতা করার নীতি বিরোধ উসকে দিয়েছে। তিনি ১৯৩৫ সালে ২৭ মার্চে অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছেন, 'যদি উভয় সম্প্রদায় না মেলে তাহলে ভারত স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসিতে জলভরা (রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড)' (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৬৩)।

মূলত 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের মূলে দেখালেন দুটি বস্তু– ধর্ম ও সরকার। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হোমরুল (স্বায়ত্তশাসন) সমর্থন করেছেন, অথচ তিনি মনেপ্রাণে ঐ স্বাধীনতার পক্ষে নন। কিন্তু ইংরেজরা হোমরুল দেয়নি। তারা এদেশের সমাজ শাসন বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যেহেতু সমাজের শাসন নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আছে বন্ধন, আচারসর্বস্ব কতগুলো নিয়ম। ধর্মের যে আচার, বন্ধন তা মানুষের মনকে বিবেচনা করে না, বাধা সৃষ্টি করে সামাজিক মিলনে। ১৯১৭ সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে হিন্দুরা গরু কোরবানি উপলক্ষ্যে মুসলমানদের উপর জুলুম করে, ২৮ সেপ্টেম্বরে শাহাবাদ জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়, ২ অক্টোবরের মধ্যে জেলার সর্বত্র দাঙ্গা বিস্তৃত হয়। ৯ অক্টোবর গয়া জেলার তিরিশটি গ্রাম লুণ্ঠিত হয়। এ দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, এদেশের ধর্ম আচার সর্বস্ব অসহনশীল, হিন্দুকে দোষী করলেন তিনি– 'নিজে ধর্মের নামে পশু হত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৫৬)।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সাল থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বৃদ্ধি পেতে দেখেছেন। তখন থেকে এই বিরোধের মূলে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্প্রেম নীতিকে চিহ্নিত করেছেন। সরকার সুকৌশলে 'ঈর্ষা' বপন করেছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (মিল্টন বিশ্বাস, ২০১১ : ৬২)। তাঁর মতে ধর্ম যতদিন আচারসর্বস্ব থাকবে ততোদিন মিলন সম্ভব নয়। 'বাতায়নিকের পত্র' (রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, ১৪২০ : ১১-১৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের আচারমগ্নতাকে নিন্দে করেছেন প্রবলভাবে। এ প্রবন্ধে তিনি আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, হিন্দু সমাজ কি বাস্তবিকই মুসলমানকে আন্তরিকভাবে বুকে টেনে নিয়েছে? একচালের নিচে বসে উভয় সম্প্রদায়ের আহার চলে না। 'পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এপারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, ...। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৫৮২)।

'সমস্যা' (১৯২৩) প্রবন্ধে তিনি দেখালেন, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর উভয় সম্প্রদায়কে মিলিত করার প্রয়াসের ভিত্তিই অবাস্তব। এর প্রমাণ খিলাফত আন্দোলন, গান্ধীজি যা সমর্থন করেছিলেন। বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষ হিন্দু সমাজের কাছে 'মানুষ' হিসেবে সম্মান পায় না। কিন্তু প্রেমকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে তা গ্রহণ করার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। আমাদের বুদ্ধি এবং কর্মের পথে আছে অবুদ্ধির খুঁটি পোঁতা। পাঠান, মুঘল সবাই এদেশে এসে শাসন চালিয়েছে ঐ অবুদ্ধির খুঁটির প্রভাবে। হিন্দুরা ইংরেজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে গেছে, আর মুসলমান জমিদারদের আলস্যের কারণে অর্থনৈতিক চিন্তার স্থবিরতার ফলে সম্পদের ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অসাম্যের। সুইজরল্যান্ডে অনেক জাতির বাস। 'সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই– ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০১)

রবীন্দ্রনাথ এ দেশে 'অসবর্ণ বিবাহের' কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু 'অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দু সমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০১)

তিনি দেখালেন উভয় সম্প্রদায় ধর্মরজ্জুতে বাঁধা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক যোগের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। 'আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে ঠেকিয়ে রাখে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)। তিনি লক্ষ করলেন, তাদের মিল হয় একমাত্র 'তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে', দেখালেন এ মিলন অসত্য, এ জন্যেই 'বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড,

১৩৯৬ : ৬০৬)। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মিলেছে, কেননা ইংরেজ সাম্রাজ্যের দুঃখ মুসলমানের কাছে বাস্তব। 'মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬০৬)– হিন্দু জাতি জন্মগতভাবে এক, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা তাদের বিভক্ত করেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিবেচনা-বিশ্লেষণ করে ধর্মকে পালনের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৭ থেকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের বিভেদের জন্যে একটি বস্তুকেই প্রধানত দায়ী করলেন, সেটি ধর্ম। ১৯২২ সালে কালিদাস নাগের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত হলো, 'কালান্তর' গ্রন্থে পত্রটি 'হিন্দু-মুসলমান' নামে মুদ্রিত। (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬১৯) প্রবন্ধে দুই ধর্মের স্বপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করে তিনি দেখালেন, এদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা অত্যল্প। এ বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন– খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা স্বধর্ম পালন করেই তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে প্রতিকৃত করতেও এরা উদ্যত। তাই এদের সঙ্গে মিলনের উপায় ওই ধর্মাবলম্বন। খ্রিষ্টানরা আধুনিক যুগের বাহন, এই জন্যে তাদের মধ্যে মধ্যযুগীয় গণ্ডির আবেষ্টন নেই। 'অপরপক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের বিরোধ সমর্থক নয়, অনেকটা অসহযোগিতামূলক। এ ধর্মের বড়ো ত্রুটি এর আচারসর্বস্বতা। তাই তাঁর মতে 'মুসলমান ধর্ম' গ্রহণ করে মুসলমানদের সঙ্গে সহজে মেলা যায়, কিন্তু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুর সঙ্গে সহজে মেলা যায় না। কেননা আহারে বিহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু ধর্ম সারাক্ষণ নিষেধ করে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, খিলাফত আন্দোলনের সময় হিন্দুকে মসজিদ বা অন্যত্র যতখানি টেনেছে, হিন্দু ততোখানি টানতে পারেনি। তিনি নিজের কাছারিতেই দেখেছেন, মুসলমান প্রজাদের বসতে দেয়া হয় জাজিমের এক প্রান্ত তুলে। তাঁর মতে আচার এবং ধর্মমত এদের মিলনের অন্তরায়– '... ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। এত বৈপরীত্য নিয়ে 'এরা কি করে মিলবে'– ভেবে রবীন্দ্রনাথ যেমন হতাশ হয়েছেন আবার আশাও ছাড়েননি। তিনি ইতিহাসচারী হয়েছেন। হিন্দু যুগের পূর্ববর্তী কালে এদেশে যারা এসেছিল গ্রীক পারসিক তারা মিলতে পেরেছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম যখন এদেশে প্রবল হলো তখন 'দুর্লঙ্ঘ্য আচারের আকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল' (*রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৯৬ : ৬২০)। সেই থেকে নিষেধ ও প্রত্যাখ্যানের ফলে লাঞ্ছিত হয় মানবমূল্য বোধ। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলেন 'মনের পরিবর্তন, যুগের পরিবর্তন', সত্য সাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির এবং ইউরোপের মতো উভয়ের মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে আগমন। নিষেধের বেড়াতে মনকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমাদের ভিতরে মূলগত যে বাধা, নিষেধ আছে তা শিক্ষায়, সাধনায় ত্যাগ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ভারতবর্ষ মিলনতীর্থ, এখানে সবার মিলন ঘটবে, এই ছিল তাঁর কামনা। কিন্তু ধর্ম তা হতে দেয়নি। এই সমস্যার সন্ধান করতে গিয়ে তিনি ধর্ম-সমাজের আচার-বিধিকে

বহুল পরিমাণে দায়ী করেছেন। এবং এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি শিক্ষা, সর্ববিষয়ে উভয়ের কাম্য এবং সামাজিক দেওয়া নেওয়াকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সমস্যাকে যুগপরিবর্তনের হাতে ছেড়ে দেন ১৯২২-এ। তিনি বোধ করেছেন, বিশ শতকেও আমরা মধ্যযুগের অন্ধতায় ভুগছি, তাই তিনি নবযুগের আলো চেয়েছেন। 'হিন্দু মুসলমান সমস্যা' (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, ১৪১৭ : ৪৪১-৪৪৭) সুদিনে দুর্দিনে একে অন্যের পাশাপাশি থাকাকে অন্তরের দাবি ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ। (অশোক সেন, ১৪২১ : ৫৬)

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ধর্ম-সমাজের আচার-বিধিকে বহুল পরিমাণে দায়ী করেছেন এবং শেষপর্যন্ত নবযুগের উপরে এই সমস্যার সমাধান ন্যস্ত করেছেন। কালান্তরের বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে মন্তব্যটি পরীক্ষা করা হলো। স্মরণীয়, 'হিন্দুমুসলমান সমস্যাটিকে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেন নি। তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথযাত্রীর মতো' (হুমায়ূন আজাদ, ১৯৭৩ : ১০৯)।

উপসংহার

বস্তুত 'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাষ্ট্র, সমাজ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কারমুক্তি এককথায় সমাজ ও রাজনীতি ভাবনার আকরগ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে দেখা যায়, একদিকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছেন অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন; আবার তার আগে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এর নিন্দা জানিয়েছিলেন। উপরন্তু গান্ধীবাদ এবং অসহযোগ আন্দোলনের সবকিছু তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবে তিনি সবসময়ই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তিনি গ্রামীণ বাংলার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রামকে ব্যাপক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এক্ষত্রে আমাদের সামাজিক রোগ তথা অন্ধ সংস্কার মুক্তির পথে শিক্ষার প্রসারকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধসমূহ রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মতামত অভিব্যক্তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত– তাঁর বক্তব্যসমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক।

সহায়কপঞ্জি

অশোক সেন (১৪২১)। *রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ক্ষুদিরাম দাস (১৯৫৮)। *সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ*। ইউ এন ধর য়্যান্ড সন্স প্রাঃ লি, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*। নিউএজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নেপাল মজুমদার (১৯৯১)। *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, ১ম-২য়-৩য়-৬ষ্ঠ খণ্ড। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১৭)। *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

প্রশান্তকুমার পাল (২০০৩)। *রবিজীবনী*, নবম খণ্ড। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-ভাবনা : পল্লিশিক্ষা, জীবনানন্দ জসীমউদদীন এবং*। অনন্যা, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৩)। *কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা*। গ্লোব লাইব্রেরি, ঢাকা।

মিল্টন বিশ্বাস (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ ও ব্রিটিশরাজ*। মূর্ধন্য, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৩২)। *সংকলন*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৬)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

শিপ্রা সরকার (২০০৮)। *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে উন্নয়ন-ভাবনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সনৎকুমার সাহা (২০১৭)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, *কালান্তর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৩৮৮)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হুমায়ূন আজাদ (১৯৭৩)। *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।